বামপন্থী আন্দোলন ও বাঙালার মধ্যবিত্ত সমাজ

সাগর বিশ্বাস

কার্ল মার্কস্ ১৮৫৩ সালে লিখেছিলেন, Hindusthan is an Italy of Asiatic Dimensions, the Himalayas for the Alps, the Plains of Bengal for the Plains of Lombardy, the Decan for the Appenines, and the Isle of Ceylon for the Isle of sicily.....Just as Italy has from time to time been Compressed by the conqueror's sword into different national masses, so do we find Hindusthan,.....Yet from a special point of view, Hindusthan is not Italy, but the Ireand of the East. And this strange combination of Italy and Ireland, of a world of voluptuousness and a world of woes, is anticipated in the ancient traditions of Hindusthan. That religion is at once a religion of sensualist exuberance and a religion of self torturing ascetism.....

ইতালির সঙ্গে ভারতের ভৌগোলিক সাদৃশ্য, আয়ার্ল্যান্ডের সঙ্গে সামাজিক সাদৃশ্য এবং ইতালি ও আয়ার্ল্যান্ডের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভারতের সাদৃশ্য সম্পর্কে কার্ল মার্কসের বক্তব্য শুধুমাত্র বাঙালাদেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। অক্ষয়কুমারের বাঙলার চিত্র দেখে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে বারবার বৈদেশিক আক্রমণের পরেও বাঙালি তার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যটুকু বজায় রাখতে পেরেছিল। কীভাবে ? উত্তর সম্ভবত এই যে তখনও মানুষের জীবন বহির্মুখী উন্মত্ততার শিকার হয়নি। তবে কি তখন ওই sensualist exuberance এবং self torturing ascetism এর বৈপরীত্যই এর পেছনে কাজ করেছে ?হয়তো তাই। তবে একদিকে exuberance এবং
অন্যদিকে self torturing ascetism এর টানাপোড়েনে সেই যুগের বাঙালি তার জীবন ধারা সম্পর্কে এক নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করে নিয়েছিল।

ব্রিটিশ যুগের আগে
প্রাক- ব্রিটিশ যুগে বাঙলার সমাজ ব্যবস্থা ছিল গ্রামভিত্তিক। অধিকাংশ মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল কৃষির উপর। এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে স্বয়ংসম্পুর্ণ Unit এর মতো গঠিত গ্রামঞ্চলে অশান্তি এবং বিভীষিকা ছিল। খেলাধু
লা, শরীরচর্চা, লোকগীতি ও শাস্ত্রালোচনা নিয়ে স্বচ্ছন্দে মানুষের জীবননির্বাহ হত। সমাজের উন্নয়মূলক কাজকর্ম সাধারণত জমিদারি প্রচেষ্টায় হত। কিন্তু একশ্রেণির মানুষ ছিলেন যাঁরা সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটু প্রগতিবাদী, অন্তত প্রচলিতের বন্ধনে বন্দি ছিলেন না, পুরনোকেই ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয় বলে মনে করতেন না। তাঁরাই সাধারণত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অচলায়তন ভাঙতে সচেষ্ট থাকতেন। এঁরা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। বিভিন্ন অব্যবস্থা এবং অত্যাচারের প্রতি এঁরাই জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, প্রয়োজন হলে প্রতিবাদও জানাতেন। তখনকার সেই নিস্তরঙ্গ সমাজে আন্দোলন ছিল না, একথা বলা যায় না। তবে একথা বলা যায়, সেই সব আন্দোলন প্রায়শ রাজনীতি - নির্ভর ছিল না, প্রধানত সেগুলি ছিল সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ভর। হাজার বছরের বাঙলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন অথবা বলা যেতে পারে ধর্মীয় সামাজিক - সংস্কৃতির উত্থান ঘটেছে বারবার। ভুললে চলবে না যে সে যুগে ধর্ম ছিল মানুষের সকল সামাজিক স্তম্ভগুলির মধ্যে বৃহত্তম স্তম্ভ। পাল - বংশীয় শাসন কালের সামাজিক সাংস্কৃতির জাগরণ যেমন ধর্মবহির্ভূত ছিল না তেমনি মোগল যুগের নবজাগরন এবং শ্রী চৈতন্যের প্রেমধর্মের জোয়ারও ধর্মবহির্ভূত ছিল না। ব্রিটিশ যুগে সংগঠিত আন্দোলনই সর্বপ্রথম ধর্মীয় প্রভাব অতিক্রম করে গড়ে উঠতে পেরেছিল। সে কথা পরে বলছি। তার আগে যে কথা স্পষ্ট করে বলা ও মনে রাখা দরকার তা হল ঃ (১) ব্রিটিশ - পূর্ব বাঙলাদেশের নিস্তরঙ্গ সমাজেও আন্দোলন, হত। (২) সে আান্দোলন প্রধানত সাংস্কৃতিক হলেও

ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ছিল না। এবং (৩) সমাজের প্রগতিশীল অংশ বা মধ্যবিত্ত শেণি এই সকল আন্দোলনে মুখ্য অংশ গ্রহণ করত।

ব্রিটিশ যুগে

বলেছি ব্রিটিশ যুগের আন্দোলনই সর্বপ্রথম ধর্মীয় প্রভাব অতিত্রম করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদেশে বিটিশ অধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসার ফলে আমাদের সামাজিক জীবন তরঙ্গিত হতে লাগল। ইওরোপেরHumanism এসে আঘাত করতে লাগল আমাদের Divinism এর উপর । একদিকে যেমন সমাজে নবীন চিন্তা পুরাতন সংস্কারকে পর্যুদস্ত করতে লাগল, অন্যদিকে বনিকের নিত্য নতুন রাজস্ব নীতি পল্লিসমাজের অভিজাতশ্রেণির বিপর্যয় ডেকে আনতে লাগল। তাদের বিপর্যস্ত করে ইংরেজ এক পেটোয়া ধনিকশ্রেণি সৃষ্টি করল যাদের সঙ্গে গ্রামবাঙলার প্রত্যক্ষ কোনও পরিচয় ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমাজবিদ বিনয় ঘোষের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবেঃ ইংরেজের নতুন নতুন পরীক্ষামূলক রাজস্বনীতি ব ারevenue policy-র ফলে সে কালের গ্রাম্যসমাজের যে অভিজাতশ্রেণী ছিল, তারা নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের চিরদিনের অভ্যাস ও ধারণাগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। তাদের ধীরে ধীরে উচ্ছেদ করে, চিরস্থায়ী রাজস্ ববন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে নতুন এক শ্রেণীর অভিজাত জমিদার গ্রাম্য সমাজে সৃষ্টি করা হল--- যাদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক রক্তের নয়, যাঁরা টাকার জোরে জমিদারী নিলেমে কিনে ঠিক ব্যবসায়ীর মত নতুন জমিদার হয়ে উঠলেন। সুতরং যেমন নতুন নগরকেন্দ্রে, তেমনি গ্রামাঞ্চলেও যে new rural aristocracy গড়ে উঠল, তাঁরা হলেন নতুন শাসক ইংরেজদের অনুগহজীবী এক শ্রেণীর হঠাৎ-অভিজাত বাupstart. এরপর যখন মধ্যস্তত্বভোগীদের উদ্ভব হলো, তখন পত্তনিদার দরপত্তনিদার প্রভৃতিদের নিয়ে বেশ বড় একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি হল গ্রাম্যসমাজে ----যা পূর্বে কখনো কোনদিন ছিল না। নতুন rural aristocracy এবং নতুন rural middle classদুইটি গ্রাম্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা উদাসীন বিত্তলোভী শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠলো।.....এরা অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করা পর্যন্ত ত্যাগ করলেন--- absentee জমিদার পত্তনিদার হয়ে উঠলেন। নগরের aristocracy র সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরা নতুন ন াগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠালোভী হলেন। ফলে হতাদরে ও নিষ্ঠুর ঔদাস্যে গ্রাম্যসমাজ দ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করল একেবারে ধবংস হয়ে গেল।

এদিকে ইওরোপীয় সমাজের মুক্ত প্রাণের আবেগ এসে পড়তে লাগল সমাজের উপর, অন্যদিকে ইংরেজের বিচিত্রঅর্থনীতি এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গ্রাম বাঙলা ভাঙতে লাগল ধীরে ধীরে। একই সঙ্গে এই দুই বিপরীত ত্রিয়া প্রতিত্রিয়া চলতে লাগল। এরই ফলে গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে কেবল ভাঙনেরই পালা চলল, পুরোনো গ্রাম্যসমাজ ধবংস হল, কিন্তু সেই ধবংসস্তুপে কোনও নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠল না।

উনবিংশ শতাব্দীর শুতে দেখা গেল পরিবর্তনের সূচনা। ইওরোপের মুক্ত জীবনবাদ সজোর আঘাত হানল এতকালের সংস্কারের দ্ধদ্বারে, ধর্মে, সাহিত্যে, সমাজে, ব্যক্তিজীবনে। তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটল রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ অ ান্দোলনে, ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে ও সমাজ সংস্কারে, মধুসুদনের জীবনে ও সাহিত্যে, ডিরোজিও এবং তাঁরআদর্শবাহী ইয়ংবেঙ্গলদের আচারে আচরণে, বিভিন্ন সমায়য়িকপত্রে। এককথায় গোটা রেনেসাঁসের সকল অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে। সেকথ া বিস্তারিত বলতে গেলে একটা গ্রন্থ হয়ে যাবে। আমি কেবল বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে শুধুম াত্র ধারলাবাহিকতা সম্পর্কে পাঠককে সজাগ রাখার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার উল্লেখ করে যাব মাত্র। রামমোহন স ম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। তিনি কতটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও কতটা সমাজতান্ত্রিক অ ান্দোলনের প্রতি মনোযোগী ছিলেন সে তর্কে না গিয়েও একথা বলা যায় যে, শ্রেণিগত বিন্যাসের দিক থেকে রাম ে মাহন ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণিরই মানুষ। তথাপি তখনকার বাঙলার সেই প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে তিনি অমন করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কেন ? ১৮১৫ সাল থেকেই তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত। সময়ায়য়িক ধনা

ঢ্যদের মতো অঢেল না থাকলেও আভিজাত্য দেখাবার মতো সম্পদ তাঁর যথেষ্টই ছিল। তথাপি বুর্জোয়াদের মতো তিনি আরও বেশি ধনোপার্জনের দিকে না ঝঁকে জীবন-পণ সমাজ সাধনার দিকে ঝুঁকলেন কেন? এর উত্তর বিনয় ঘোষের ভাষাতেই দেওয়া যায়--- তিনি বুঝেছিলেন যে নতুন বিত্তের মানদন্ড সামাজিক ভাঙনের ভিতর দিয়ে যে সচলতা সৃষ্টি করেছে----সেই সচলতা মেকী সচলতা---সামজবিজ্ঞানীরা যাকে Spurious mobilityবলেন, সেও তাই। এই স্থূল সচলতা সাময়িক---এর ফলে কোনো মানসিক ও আদর্শগত সচলতা দেশবাসীর জীবনে আসবে না এবং তা না এলে সমাজ আবার আচল অনড় হয়ে বিষিয়ে উঠবে। নতুন বিদ্যা, জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকস্পর্শেই এই মানসিক সচলতা আসতে পরে। তাই তিনি পাশ্চাত্য দর্শন ও প্রাচ্যবিদ্যা, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধর্মের গভীর অনুশীলনে মনোনিবেশ করলেন। এমন একটি নতুন আলেকের সন্ধানে, যে আলোক জ্বালিয়ে দিতে পারলে আমাদের দীর্ঘকালের প্রাণহীন অচল আচরণ, অভ্যাস, অনুষ্ঠান, অজ্ঞান প্রসূত ধ্যনধারণা ইত্যাদি পরিবর্তিত হতে পারে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি বাঙলাদেশে নবজাগরণের সূচনা হলো নতুন বিদ্যা ও বুদ্ধির অনুশীলনের ভিতর দিয়ে। এই অনুশীলনের পথ ধরেই এদেশে পাশ্চাত্য ভাবধাবা, জীবনদর্শনের রীতিনীতি সব একে একে প্রবেশ করেছে এবং ক্রমে দেশীয় ঐতিহ্যর সঙ্গে তার সংঘাতও আরম্ভ হয়েছে। নতুন agents of westernisation এবং পুরাতন forces of tradition ---এই দুয়ের সংঘাতের ভিতর দিয়ে ঊনিশ শতকে বাঙলার নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। এবং সেই নব্যশিক্ষার প্রসারের ফলে নতুন বিদ্যাজীবী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরও বিকাশ ও বিস্তার হয়েছে ধীরে ধীরে। এই নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই নবজাগরণের আদর্শের ধারক ও বাহক হয়েছেন। এই নতুন বিদ্যাবুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশই সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাঁরা গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীকে এক বাঁধনছেড়া বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে রেখেছিলেন। এই বাঁধনছেড়ে উত্তাল প্রাণচাঞ্চল্যের গর্ভ থেকেই একদিন জন্ম নিলো নবীন ভারত ---সত্য হলো রামমোহনেরই কথা----Enemies of liberty and friends of despotism have never been and never will be successful."

মাও-সে-তুঙ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিনিধি এবং জাতীয় বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত করে বলেছেন যে, দেশ যখন বিদেশি পুঁজি কিংবা যুদ্ধবাজ নেতাদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, তখন এই শ্রেণি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সাম্রাজ্যবাদ বা যুদ্ধবাজ নেতাদের বিদ্ধে গণ-সংগ্রামে সহায়তা করে। ব্রিটিশ ভারতে এই সত্যকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। সাম্রজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম এবং ভারতের স্বধীনতা আন্দোলন সর্বহারার আন্দোলন ছিল না। নেতৃত্ব যাদের হাতেই থাক এ আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিল প্রধানত শিক্ষিত বিত্তবান এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল এদের হাতে।

পাতিবুর্জোয়া বলতে মাও-সে-তুঙ মালিক শ্রেণির কৃষক, দক্ষ কারিগর, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসমাজ, শিক্ষকসমাজ, কেরানি, ছোট আইনজীবী ও ছোট ব্যবসায়ীদের নির্দে শ করেছেন। দেশের মধ্যে যখন বিপ্লবী আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে, তখন এরাও সেই সর্বহারার বিপ্লবে সামিল হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জাতীয় বুর্জোয়া এবং পাতি বুর্জোয়া শ্রেণির ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবি রাখে। অবশ্য এই বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণির ছিল না বলেই আন্দোলন সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত হতে পারেনি।

প্রাক - স্বা৪ধীনতাকালে ১৯৩৮-৩৯ সালেই জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম একটি বামপন্থী শক্তি সংহত হয়েছিল। বাঙলাদেশ ছিল সেই শক্তির হৃদ্‌পিন্ড। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি রূপ গঠিত হয়েছিল গান্ধীজির হাতে, অন্যটি সুভাষচন্দ্রের হাতে ---একটি প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপসধর্মী অন্যটি আপসহীন। ১৯২১ সালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগ করবার অদম্য উৎসাহ নিয়ে যে সুভাষচন্দ্র বিলেত থেকে আই. সি.এস-এর লোভনীয় চাকরি ছেড়ে ভারতে এসে প্রথমেই ভারতের মুক্তিসংগ্রামের নেতা গান্ধীজির সঙ্গে বোম্বাইয়ের দেখা করলেন, দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্যের জন্য সেই সুভাষচন্দ্রই পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছেন---- 'Gandhiji

should now be regarded as an old, useless piece of furniture.' যে মুহূর্তে জাতীয় কংগ্রেস নেতারা বিপ্লব এবং রক্তপাতের আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একঘেয়ে আলাপন-আলোচনা চালিয়ে চলেছেন, তখনই সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে শোনা গেল---- 'No real change in history has ever been achieved by discussion.' এমনকী 'India can well afford to bring a blood sacrifice for her liberation.' দীর্ঘকাল কংগ্রেসের মধ্যে থেকে গান্ধী নেতৃত্বের গতি প্রতৃতি দেখে সেই সুভাষচন্দ্রই দুঃখ করছেন--- 'The entire intellect of the Congress has been mortgaged to one man.'

১৯৩৮-৩৯ সালে হরিপুরা এবং ত্রিপুরি কংগ্রেসের ঘটনাবলীতে স্পষ্টই দখা গেল সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে একটি বামপন্থী শক্তি সংহত হয়েছে। গান্ধীজি প্রমুখ রক্ষণশীল নেতারা সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন জনপ্রিয়তা দেখে ভীত হয়ে উঠেছিল। জহরলাল নেহে স্বয়ং সুভাষ নেতৃত্বের প্রতি কাটক্ষ করে একটি চিঠিতে লিখেছেন----আমি জানিান, তুমি কাকে বামপন্থী এবং কাকেই বা দক্ষিণপন্থী বলে বিবেচনা কর। তবে তোমার নির্বাচনী লিপিসমুহ পাঠ করে আমার মনে হয়েছে গান্ধীজি ও ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর অনুগামীদের তুমি দক্ষিণপন্থী বলে মনে কর এবং তাঁদেরই যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের তুমি বল বামপন্থী। আমার বিবেচনায় তোমার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কঠিন ভাষা প্রয়োগ করে কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্বের সমালোচনা করা এবং তাকে আত্রমণ করাই কি রাজনীতিতে Leftism এর পরিচায়ক? এর পরের ঘটনা দ্রুত এগিয়ে গেল। দেখা গেল ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায়
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক বসল সুভাষচন্দ্র সেখানে রাষ্ট্রপতির পদ পরিত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সভাপতিকে অপসারণের জন্য সেদিন যে অসহযোগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, কংগ্রেসের ইতিহাসে সে ছিল এক অভূতপূর্ব কলঙ্কিত ঘটনা। চল্লিশ বছর পরে ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনের পরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা এবং কংগ্রেস সিন্ডিকেটের ঘনীভূত আত্মকলহ সেদিনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ইতিহাসের পুনারাবৃত্তি কখনো কখনো সত্যই ঘটে।

সুভাষচন্দ্র সেদিন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে চুপ করে থাকেননি। বামপন্থী শক্তি সমন্বয়ে গঠন করেছিলেন নতুনর াজনৈতিক দল, ফরোয়ার্ড ব্লক। দলের মুখপাত্র হল ফরোয়ার্ড । সেদিন ভারতবর্ষের সমস্ত বামপন্থী শক্তি যদি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানাত তাহলে ভারতবের্ষের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে রচিত হত। তার অনেক আগেই (১৯২১ সালে) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছে। তখনো কমিউনিস্টদের শক্তি কোনো উল্লেখযোগ্য আকৃতি নেয়নি। ভরতবর্ষের সেই রাজনৈতিক সংকটমুহূর্তে কমিউনিস্টরা ফ্যাসিজমের ভয়ে সুভাষচন্দ্রের পেছনে দাঁড়াতে চাননি। তবু একথা সত্য যে হরিপুরা এবং ত্রিপুরি কংগ্রেসের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী দেশের অগণিত মানুষের চোখের সামনে রাজনীতিতে বামপন্থার একটা সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরতে পেরেছিল। আগেই বলেছি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি রূপ গঠিত হয়েছিল গান্ধিজির হাতে, অন্যটি সুভাষচন্দ্রের হাতে---একটি নরমপন্থী, অন্যটি চরমপন্থী। দুটি পথেই সর্বস্তরের মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিল---দুটি পথেই ছাত্র, শিক্ষক , বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে রাশিয়া থেকে জার সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি অদম্য সাহসে উন্মুক্ত বন্দুকের সামনে প্রসারিত বুক নিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়াত সমাজের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা। হাজার হাজার মৃত্যুর বিনিময়ে একদিন রাশিয়া জার শাসমুক্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষেও শিক্ষিত তণ বা শিক্ষকের একটুকু ভয় ছিল না
ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে কিংবা অগ্নিগোলার সামনে বুকের আবরণ উন্মুক্ত করে দিতে। আজ ভ্যান ত্রয়ীর কাহিনিপড়তে পড়তে আমাদের চোখ অশ্রসজল হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতের মাটিতে এমন কত ত্রয়ীর তাজা রক্তে ব্রিটিশ বন্দুকের তৃষ্ণা মিটেছে, ইতিহাস কি তার নির্ভুল হিসাব দেবে কোনোদিন? শিক্ষিত যুবক কিংবা বুদ্ধিজীবী শিক্ষকের কাছে সেই মরণখেলা ছিল যেন একটা প্লেজার যাতে মুখের হাসি বিনষ্ট হয় না। যাই হোক, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী প্রতিত্রিয়া এবং ব্রিটিশ সরকারের সকল চত্রান্ত ভেদ করে সুভাষচন্দ্রকে একদিন বিদেশে পাড়ি দিতে হল। কিন্তুযে বিপ্লবাত্মক শক্তির (spirit) মুক্তি ঘটিয়ে গেলেন পরবর্তী কালে কোনোমতেই আর তার মাত্রাগত হ্রাস হল না।

একদিন ভারত স্বাধীনতা পেল। সে স্বাধীনতা লাভের দ্রুততায় সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী নেতৃত্বের আবদান আজ আর কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। ঔপনিবেশিক সরকারের হাত থেকে স্বাধীন ভারত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। তৈরি হল নতুন সংবিধান। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় যাঁরা এলেন তাঁরা শুধু ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য এত ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন যে, আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে দেরি হল না।

স্বাধীনতার পর

স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসের প্রশাসনিক দুর্বলতা, ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যে বৈষম্যের সুযোগে বামপন্থী শক্তি দ্রুত সংহত হয়ে উঠতে লাগল। কমিউনিস্ট পার্টি হল এই শক্তির প্রধান উৎস। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি তার বয়সের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগোতে পারেনি। এর কতকগুলি বড় কারণও ছিল। প্রথমত ভারতের উপর ইঙ্গ- মার্কিন প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় পড়ে আছে। দ্বিতীয়ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এখনো কমিউনিস্টদের ভাষায় বুর্জোয়া, পাতি বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে যার সম্ভব্য ফল হল দলের মধ্যে অন্তর্কলহ। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের বত্রিশ জন সদস্য দল থেকে বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘকাল ধরেই পার্টির অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে চীন ও সোভিয়েতের নীতিকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই উত্তাপেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটল ওই বছরেই ৭ মার্চ তারিখের কারেন্ট পত্রিকার একটি প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ উঠল চেয়ারম্যান এস.এ. ডাঙ্গের বিদ্ধে যার পরিণতি দাঁড়াল দ্বিতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন। বিদ্রোহী এই পার্টির নাম হল কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)। যদিও অ-মার্কসবাদী কমিউনিস্ট সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব নিলেন কেরলের এ. কে. গোপালন, অন্ধ্রের পি. সুন্দরাইয়া ও তামিলনাড়ুর পি. রামমুর্তি প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। কলকাতায় ত্যাগরাজ হলে চীনের চেয়ারম্যান মাও-সে- তুঙের ছবি স্থাপন করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশন বসল--- আনুষ্ঠানিকভাব জন্ম হল ভারতের দ্বিতীয় কমিউনিস্ট পার্টির।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল ১৯৬৯ সালে। নকশালপন্থী বলে কথিত অতিবাম কমিউনিস্ট কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে অধিবেশন বসিয়ে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অনুষ্ঠানিক জন্ম ঘোষণা করলেন। এখানেও ছবি ছিল মাও-সে-তুঙের। বরং কিছু বেশি ছিল যা, তা হল মাও-সে-তুঙের প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য। এঁরা দলের নাম দিলেন ভরতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্বাদী লেনিনবাদী)। অবার অচিরেই সংকট সৃষ্টি হল পরিমল দাশগুপ্ত এবং নাগি রেড্ডিকে নিয়ে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে অন্ধ্র, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীরের যে বত্রিশ জন সদস্য বেরিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে নাগি রেড্ডিও ছিলেন। দ্বিতীয় পার্টি থেকে তৃতীয় পার্টিতে এলেন----এখন আবার চতুর্থ কমিউনিস্ট দল গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। জানি না এ দলের চরিত্রগত বন্ধনীর মধ্যে মাওবাদী কিংবা চে-বাদী লেখা থাকবে কি না। কিছুইবিচিত্র নয়। অন্তত ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনীতিতে বোধহয় সবই সম্ভব। কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের অর্থ বোঝা যায় কিন্তু কনিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান ভগ্নাংশের ব্যাখ্যা বোঝা সাধারণের পক্ষে দুষ্কর। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই বিরোধের তাৎপর্য সম্ভবত এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড হো-চি-মিনও অনুধাবন করতে পারেননি। মৃত্যুর পরে তাঁর যে উইলের কথা প্রকাশিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন---- ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলিতে মতানৈক্য দেখে আমি ব্যথিত। আমি কামনা করি, মার্কস্বাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য পনুঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করবে। আমি নিশ্চিত যে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হবে। উইলের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিন সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট, তণ সম্প্রদায় এবং শিশুর প্রতি তাঁর সৌভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। কমরেড হোর অন্তিম বাসনা হয়তো একদিন সার্থক হবে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে কেন এই আত্মকলহ ? এর ফলে কি ধীরে

ধীরে প্রতি বিপ্লবের পথটিই প্রশস্ত হয় না ? আমাদের দেশেই বা কমিউনিস্ট পার্টির অখন্ডতা বজায় থাকে না কেন ? এদেশে বারবার কমিউনিস্ট ভাঙন কেন অনিবার্য হয়ে ওঠে ? সারা ভারতবর্ষে রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর মধ্যে পার্থক্য কতটা ? জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সীমারেখা সাধারণের কাছে কতটা পরিষ্কার ?এসব প্রশ্নের উত্তর জটিল তত্ত্বময়। সাধারন মানুষ শেখে বাস্তব কর্মসুচী আর প্রয়োগের মাধ্যমে। জীবনের দাবি থেকে। তাই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকেও রাজ্যে রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্টার কথা ভাবতে হয় ঃ "The Communist Party in India (Marxist) which is vitally interested in building the united front of different democratic parties and groups including the S. S. P., P. S. P and others, can not but take this development into serious account . Prompted by the desire to consolidate the existing U.F. with them in states where it has materialized, and eager to extend it to other states and areas--" (১৯৬৮ সালের ২৩ - ২৯ ডিসেম্বর কোচিনে অনুষ্ঠিত ৮ম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব থেকে)

সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির পাটনা কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের অংশবিশেষ লক্ষ করা যেতে পারে --- কমিউনিস্ট পার্টি আবারও জোরের সহিত ঘোষণা করিতেছে যে, এই সংকট মুহুর্তে বামপন্থী পার্টিগুলির দায়িত্ব হইতেছে অপরিসীম এবং চূড়ান্ত। অবিলম্বে তাহাদের এমন সব জরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের ঐক্য এবং ট্রেড ইউনিয়ানের আন্দোলনের একতা সংগ্রামক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়। সংসদীয় গণতন্ত্র এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারণের মান রক্ষার জন্য তাহাদের ভারতব্যাপী এক নিরবচ্ছিন্ন গণ আন্দোলন শু করিতে হইবে। নতুন এলাকতেও তাহাদের প্রবেশ করিতে হইবে এবং একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক মঞ্চের উপর এমন এক ন্যুনতম রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য জরী ব্যরস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ গণ - আন্দোলনকে নতুন নীতিসমূহের সপক্ষে দেশব্যাপী এক জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে উন্নীত করা য়ায়। অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও মধ্যপন্থায় অবস্থিত পার্টি ও গ্রুপগুলিকে এবং কংগ্রেসের মধ্যকার ও কংগ্রেস অনুসরণকারী জনগণের গণতান্ত্রিক অংশকে রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পথ প্রস্তুত করিতে রাজনৈতিক কর্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ বামপন্থী ঐক্যই সমর্থ। কমিউনিস্টদের ভিতরকার ভেদাভেদ দূর করিয়া আন্দোলনে ও গণসংগঠনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই হইতেছে অন্য দেশের মতো ভারতেও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও শাসকশ্রেণীর বিদ্ধে আরও সংগ্রাম পরিচালনার অন্যতম প্রধান উপাদান।

অনুরূপভাবে আরও অনেক বামপন্থী সোস্যালিষ্ট দলের রাজনৈতিক প্রস্তাব উদ্ধার করে দেখানো যায় যে, প্রত্যেকেই একটি সংযুক্ত বামপন্থী আন্দোলন ও বামপন্থী শক্তি ঐক্যের কথা বলেছেন। গত বছর লন্ডন টাইমস্ পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধে মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু যথার্থই লিখেছিলেন ঃ বিশেষ বিশেষ স্থানিক ঘটনার বিচার করে এক সাধারণ শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট শক্তি সমাবেশে যদি আমরা দেখিয়ে দিতে পারি যে, এই স্থানিক ভেদগুলির ভূমিকা গৌণ, তাহলে ভারতবর্ষের এক অখন্ড কমিউনিস্ট আন্দোলনে গড়ে তোলা কঠিন বলে আমার মনে হয়না।.....কংগ্রেসকে এমন সংঙ্কটের সম্মুখীন দেখা যাচ্ছে, যা কালে কালে আরও তীব্র হবে, তার সঙ্গে বাড়বে কংগ্রেসের ভিতরকার উপদলীয় রেষারেষি। নির্দিষ্ট নিষয় সম্পর্কে আদর্শগত ও কার্যত্রমত মতদ্বৈধ প্রকট হয়ে উঠেছে, যার সম্পর্কে জনগণ পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে আজ বেশি সচেতন। বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ও শক্তি সঞ্চয়ের চেয়ে আজ বেশি সচেতন। বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ও শক্তি সঞ্চয়ের পক্ষে এ যে কতবড় সুযোগ দেবে তা বলাই বাহুল্য। কমিউনিস্ট পার্টি দুটোর তত্ত্বগত প্রভেদ এবং কার্যত্রমগত বিস্তর পার্থক্য বর্তমানেযা আছে , তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এদের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা দেদেখছিনা। কিন্তু এমন সুযোগ আছে, যেখানে শুধু এই দুটো পার্টিই নয়, বরং বামপন্থী ও গণতন্ত্রী সবগুলি দলই যুক্তভাবে কাজ করতে পারে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এই প্রত্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট পন্থার নির্ভুলতা এবং কমিউনিস্ট পদ্ধতির প্রতিযোগ ক্ষমতা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে।

কিন্তু তত্ত্বের ক্ষেত্রে যা-ই থাক না কেন, বাস্তবে কিন্তু ভাঙনের পর্ব যত দ্রুত সম্পন্ন হয়, মিলনের বা বোঝাপড়ার পর্ব তত দ্রুত সম্পন্ন হয় না। তাই দেখা গেল, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি তাদের প্রধান শত্রু কংগ্রেসের বিদ্ধে একজোট হতে পারল না। পাঁচদল এবং সাতদলের জোট গঠন করে নির্বাচনে কার্যত ব ামপন্থীরা পারস্পরিক বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন। ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেল। ভেঙে গেল ৬৯ স ালে অন্তবর্তী নির্বাচনে গঠিত ফ্রন্ট সরকারও। ৭০ এর মার্চ মাসে সরকার ভেঙে যাবার পর বামপন্থীরা আবারশে াচনীয়ভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। কনিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন আগেই ভেঙে গিয়েছিল। এবার ভাঙল শিক্ষক, মহিলা ও শ্রমিক সংগঠন। এইসব ভাঙাচোরা আন্দোলন ও বৈপরীত্যের মধ্যে বর্তমান বামপন্থী আন্দোলনের ধারা অনুসন্ধান করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সারাদেশে বামপন্থী এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এ এক সঙ্কটময় কাল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সমাজতান্ত্রিক দলগুলির দুঃসময়। কিন্তু সে কথা থাক। প্রগতিশীলআন্দে ালনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজ বরাবর গৌরবজনক ভূমিকা পালন করলেও মার্কসীয় তত্ত্বে এই শ্রেণিকে বিলপেবের অন্তরায় বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সে তত্ত্বের কোনও পরিবর্তন হয়নি। যদিও কনিউনিস্টদের মতে ঃ উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টনের প্রধান উপকরণগুলির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধানের ভার সমগ্র সমাজের দখলে আনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রনিক কৃষক ও মধ্যবিত্তের রাষ্ট্র গঠন ----এই হলো সমাজতন্ত্রেরমূল শর্ত।

বর্তমান সময়ে বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজ ভাঙছে। একদিকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট এবং অসাম্য, অন্যদিকে জটিল রাজনৈতিক ঘুর্ণাবর্তের মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজ তার নিজস্ব অক্ষরেখার উপর আর তাকে ধরে রাখতে পারছে না। এই ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন নতুন কিছু গঠন করবার উদ্যম, উৎসাহ অন্যদিকে প্রচলিতের বন্ধন থেকে বিদ ায়ের সুপ্ত বেদনাবোধ তাদের নাড়া দিচ্ছে, বিচলিত করছে। কেননা, সমাজের এই অংশটি যেমন চিরকাল একটু শা ন্তিপ্রিয়, সৎ এবং সুস্থ নাগরিকবোধ সম্পন্ন, তেমনি আবার সামাজিক অচলায়তনের বেড়া ভাঙবার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী সৈনিক। এই দ্বৈত চরিত্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সমাজের অন্যান্য স্তর থেকে পৃথক করবার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়ই হোক আর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায়ই হোক, সমাজের যারা উঁচুতলার মানুষ তারা ব ারবারই শোষকের ভুমিকা পালন করেছে। শোষন করেছে নিচুতলার শ্রমজীবী মানুষকে। শোষণের বিদ্ধে যদিও ওই সর্বহারা শোষিতশ্রেণির প্রতিবাদে ফেটে পড়ার কথা----তবুও বহু শতাব্দী ধরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে প্রতিপালিত ও নানা প্রকার অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সর্বহারা শ্রেণি তা পারেনি। এক্ষেত্রে পথনির্দেশক শক্তি হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণিই বরাবর এগিয়ে এসেছে সামাজিক অচলায়তনের বেড়া ভাঙবার আন্দোলনের পুরোভাগে। তারাই শ্রমিকশ্রেণিকে যথাসম্ভব সংহত করেছে, বঞ্চনার দিকগুলি সম্পর্কে তাদের অবহিত করেছে। শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য, বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য, বহু ছাত্রকে রক্ত দিতে হয়েছে, জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। বহু শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীকে শাসক শ্রেণির অন্ধকারায় দিন কাটাতে হয়েছে। এই ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীর া প্রধানত বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। আজকের বামপন্থী আন্দোলনের দিকে তাকালেও দেখা যাবে তার নেতৃত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এই মধ্যবিত্ত সমাজ। সূক্ষ্ম শ্রেণিবিভাগের মধ্যে নাগিয়ে মোটামুটিভাবে মাও - সে-তুঙ এদেরই বলেছেন পাতি - বুর্জোয়া। কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকেরা এদেরই মনে করেন সুবিধাবাদী শ্রেণী। এরা বিপ্লবের অক্ষশক্তির মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারে কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে পিছু হটতে পারে, বিশ্বাস - ঘাতকতাও করতে পারে। অবশ্য বর্তমান বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এই সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়টি তর্কাতীত নাও হতে পারে। কারণ একথা সর্বতোভাবে মেনে নিলে ধরে নিতে হয়, এদেশের কমিউনিস্ট আন্দে ালন এখনো পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক ও সুবিধাবাদী শ্রেণির কুক্ষিগত। কেননা বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব কায়েম হয়ে গেছে একথা কেউই বলবেন না। উপরন্তু নেতৃত্বের মধ্যে বুর্জোয়া- পা তিবুর্জোয়া মনোভাবের ব্যাপক অস্তিত্বও লক্ষ্যকরার মতো। তথাকথিতঅনেক সাচ্চা কমিউনিস্টও এই রোগে প্রবলভ

াবে আক্রান্ত। যার ফলে বামপন্থী রাজনৈতিক শিবিরে গুত্বপুর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে না। বস্তুত একথা সত্য যে আজকের বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অবমুল্যায়ন করারওপ্রশ্ন ওঠে না এইকারণে যে, তাদের বাদ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা এই মুহূর্তে ভাবাই যায় না। তাই কমিউনিস্ট ও অ- অমিউনিস্ট সকলেরই রাজনৈতিক প্রস্তাবে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার কথা বলা হয়ে থাকে।

তবু বলব, পুর্বোল্লিখিত দ্বৈতচরিত্র ও নেতৃত্বে মোহাবিষ্টতাই সারাদেশে বামপন্থী শক্তি সমূহের সমন্বয় সাধনের অন্যতম পরিপন্থী উপাদান হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই মুহুর্তে মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মবিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্ন জরি হয়ে দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে এ জন্যই যে আমাদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি এখনো পর্যন্ত তারাই। সকল প্রকার স্পর্শকাতরতা থেকে মুক্ত হয়ে আদর্শভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিবাদী প্রতিপক্ষের বিদ্ধে শক্তি সমাবেশ করতে না পারলে সাম্যবাদী প্রতিযোগ ক্ষমতা কেবল অসার বলেই প্রতিপন্ন হবে না, সারাদেশে বামপন্থী রাজনীতি এক চূড়ান্ত সংকটের সম্মুখীন হবে।